কার্টুনিস্ট হওয়ার স্বপ্ন আরিফ কখনোই দেখেনি। ছবি আঁকাটা তার নেহাতই শখের। ছোটো থাকতে কাঠি দিয়ে মাটিতে আকিবুকি, পরে পেন্সিল দিয়ে কাগজে। গ্রামের ছেলে রং কোথায় পাবে? কেইস্তা পাতা দিয়ে সবুজ, সন্ধ্যা মালতীর লালচে গোলাপী আর রান্নাঘর থেকে চুরি করা হলুদ তার রংয়ের ঘাটতি মেটাতো। কাঠিতে কাপড় পেচিয়ে চলতো আরিফের পেইন্টিং। প্রতি বছর পচিশে বৈশাখের জন্য অপেক্ষা তার। রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তীতে শাহজাদপুর কুঠিবাড়িতে তিন দিনের এক মেলা বসে। পলিথিন কাগজে মুড়ে, কাঠ দিয়ে আটকে আরিফ তার শিল্পসম্ভার নিয়ে হাজির হতো সেখানে। সারাবছর জমানো পয়সা দিয়ে স্টল নিতো। কেউ ছবি কিনতে চাইলে বিক্রি করতো না, এগুলো ছিলো তার প্রাণের সম্পদ।

সব বদলে গেলো একটা বিজ্ঞাপনে। ২০০৪ সালে বিচ্ছু নামে একটা ফান ম্যাগাজিন পাঠকদের কাছে কার্টুন চাইলো। আরিফ এর আগে কখনো কার্টুন আঁকেনি। এবার আঁকলো, পাঠালো, আর সেটা ছাপাও হলো। গ্রামের ছেলের আঁকা কার্টুন একটা জাতীয় পত্রিকার সাময়ীকিতে ছাপা হয়েছে! আরিফ পুরো স্বর্গে! চেনা-অচেনা সবাইকেই সে দেখালো তার কীর্তি। সেইসঙ্গে পুরোদস্তর কার্টুনে মন দিলো। ‘উন্মাদ’ ও ‘আলপিন’-এর মতো বিখ্যাত ম্যাগাজিনগুলোতেও ঠাই পেলো তার আঁকা।

আরিফের বাবা-মায়ের বিচ্ছেদ হয়ে গেছে ছোটো থাকতেই। আত্মীয়দের বাসাতেই তার বেড়ে ওঠা। পরিবারের একমাত্র ছেলে হিসেবে তাই উপার্জনের কথাও ভাবতে হয়। কিছু করতে, সেইসঙ্গে কার্টুনটাও ধরে রাখতে ঢাকায় চলে এলো আরিফ। চাচাতো ভাইয়ের মুদি দোকানে কাজ নিলো। মাগনা থাকা-খাওয়া আর সামান্য পকেট খরচ- আরিফ তাতেই খুশী। দুপুরের খাবার পর দোকান একটু ফাঁকা থাকে। সে সময়টায় চলে কার্টুন আঁকা। আর বাসায় ফেরার পর ঘুমানোর আগ পর্যন্ত।

এভাবেই একদিন খ্যাতিও চলে আসে। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ আয়োজিত এক কার্টুন প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় পুরস্কার জেতে আরিফ। এরপর ডেইলি স্টার ও দুর্নীতি দমন কমিশনের যৌথ আয়োজনে এক প্রতিযোগিতায় একদম প্রথম। রফিকুন্নবী (রনবী) ও শিশির ভট্টাচার্য্যরা অবাক হন জেনে যে আঁকাআঁকিতে কোনো ধরণের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাই নেই আরিফের! এর মধ্যে প্রথম আলো টুন হান্টেও দুটো বিভাগে জয়ী হয় সে। তবে আলপিনের সম্পাদক সুমন্ত আসলাম জানিয়ে দেন সব জায়গায় কার্টুন পাঠালে হবে না, প্রথম আলোয় ছাপাতে হলে শুধু সেখানেই কার্টুন দিতে হবে। আরিফ মেনে নেয়, যোগ দেয় আলপিনের প্রদায়ক কার্টুনিস্টদের দলে।

মাসখানেক পর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে আরিফের। রোজার মাস। আরিফের ইচ্ছে আঁকাআকি বাবদ অল্প যা কিছু পাওয়া যায় সেটা দিয়ে মা আর বোনের জন্য কিছু নিয়ে যাবে ঈদের ছুটিতে। এর মাঝেই আলপিনে ছাপা হলো আরিফের সেই কুখ্যাত কার্টুনটি। এক বৃদ্ধ লোক এক বাচ্চাকে তার নাম জিজ্ঞেস করছে। ছেলেটি নাম বলার পর লোকটি তাকে বকলো নামের আগে কেনো মোহাম্মদ (দঃ) লাগায়নি সে। এরপর তাকে তার কোলের বিড়ালটির কথা জিজ্ঞেস করলে ছেলেটি এবার বিড়ালের আগে মহানবীর নাম বসিয়ে উত্তর দিলো।

আলপিনের সেই সংখ্যাটি বাজারে আসার সঙ্গে সঙ্গে আগুন লেগে গেলো চারদিকে। বায়তুল মোকাররমে একদল মৌলবাদী আলপিন পোড়ালো, প্রথম আলো সম্পাদক ও কার্টুনিস্ট আরিফের গ্রেপ্তার ও চরম শাস্তি দাবি করলো। প্রথম আলো প্রথম পাতায় ক্ষমা চেয়ে সম্পাদকীয় ছাপালো, আলপিন বন্ধ ও আরিফের কোনো কার্টুন না ছাপানোর প্রতিশ্রুতি দিলো। সম্পাদক মতিউর রহমান বায়তুল মোকাররমের খতিবের কাছে ক্ষমা

চেয়ে পার পেলেন, পার পেলো না আরিফ। ছয় মাস রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও ধর্ম অবমাননার দায়ে জেল খেটে গত ২০ মার্চ অবশেষে মুক্তি পেয়েছে সে। তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ থেকে খালাস দেয়া হয়েছে তাকে। তার মুখ থেকেই চলুন শোনা যাক পুরা ব্যাপারটা।

এমন একটা কার্টুন আঁকার আইডিয়া কোথায় পেলেন? কেন আঁকলেন এটা?
আসলে আমি বুঝতে পারিনি এটা নিয়ে এত হৈ চৈ হবে। আমি সিরাজগঞ্জের ছেলে। আমাদের ওখানে এই কৌতুকটা খুবই প্রচলিত, ছোটবেলা থেকেই শুনে আসছি। আমি শুধু একটু রূপান্তর করেছি। আসলে আমি চেয়েছিলাম আমাদের ধর্মীয় শিক্ষার অসম্পূর্ণতাটুকু তুলে ধরতে। মুরুব্বীরা আমাদের শেখান নামের আগে মোহাম্মদ ব্যবহার করতে। কিন্তু কার নামের আগে সেটা ব্যবহার করা যাবে, কোথায় যাবে না- সেটা তারা বলে দেন না। মুক্তি পাওয়ার পর আমি অবাক হয়েছি জেনে যে ইসলামী ছাত্র শিবিরের কিশোর কন্ঠ (নভেম্বর, ১৯৯৮ সংখ্যা) নামের একটা পত্রিকায় একই কৌতুক একটু অন্যভাবে ছাপা হয়েছে।

আপনি দেখেছেন সেটা?
হ্যাঁ, দেখেছি।

এরপর কি হলো?

গত বছর ৫ সেপ্টেম্বর আমি কার্টুনটি আঁকি। আলপিনে তা ছাপা হয় ১৭ সেপ্টেম্বর। সেদিন বিকেলের দিকে এক সহ-প্রদায়ক আমাকে ফোন করে জানায় যে আমার কার্টুনটি নিয়ে নাকি খুব গন্ডগোল হচ্ছে। সে বাসে করে কোথায় যাচ্ছিলো, তাই পুরোটা খুলে বলতে পারেনি। আমি ভয় পেয়ে গেলাম। ফোন করলাম আলপিন সম্পাদক সুমন্ত আসলাম ভাইকে। উনি বললেন দুঃশ্চিন্তা না করতে, সব ঠিক হয়ে যাবে। আর ফোন খোলা রাখতে বললেন আমাকে। সে রাতটা আমার নির্ঘুম কেটেছে।
পরদিন সকালে আমার চাচাতো ভাইকে খুলে বললাম ঘটনা। উনি আমাকে গা ঢাকা দিতে বললেন। এরপর সাংবাদিক টিপু সুলতান (আওয়ামী লীগ সাংসদ জয়নাল হাজারীর নির্যাতনে মৃত্যুর মুখে পড়া এই সাংবাদিক আন্তর্জাতিক শিরোনাম হয়েছিলেন) ভাইয়ের ফোন এলো। উনি বললেন সিআইডির গোয়েন্দারা আমার সঙ্গে দেখা করতে চান। আমি যেনো ভয় না পাই এবং উনাদের সহযোগিতা করি।

আপনি তখন কোথায়?

দোকানে। এরপর সিআইডি থেকে ফোন এলো, তারা আমার ঠিকানা জিজ্ঞেস করলেন। আমি বললাম। ঘন্টাখানেক পর পুলিশের একটি জিপ এসে থামলো দোকানের সামনে। আমি তখন বাইরে দাঁড়িয়ে। একজন গোয়েন্দা কর্মকর্তা এসে আমার খোঁজ করলেন। পরিচয় দিয়ে বললাম আমিই আরিফ। উনি বললেন তার সঙ্গে জিপে উঠতে। আমাকে মিন্টু রোডে তাদের কার্যালয়ে যেতে হবে কিছু জিজ্ঞাসাবাদের জন্য। এরপর ওয়ারল্যাসে কাকে যেন বললেন- ওকে আমরা ধরেছি স্যার। আমি ভড়কে গেলাম। জিপে উঠতে উঠতে জানতে চাইলাম আমাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে কিনা। উনি বললেন যে আমাকে নিরাপত্তা হেফাজতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আমি ফোন করতে চাইলাম আমার চাচাতো ভাইকে, কিন্তু উনি আমার মোবাইল নিয়ে নিলেন। একটু পর ফেরত দিলেন অবশ্য। আমি সুমন্ত ভাইকে একটা এসএমএস করলাম। উনি কোনো জবাব দেননি।

জেরার সময় কি আপনাকে মারধোর করা হয়েছে?

না, মোটেই না। আমাকে নিয়ে অফিসারটি উপরতালায় একজন বড় কর্মকর্তার কাছে নিয়ে গেলেন। উনি তাকে বললেন- তোমাকে পুরস্কার দেয়া হবে। হয়তো আমার মতো একজন দাগী অপরাধীকে গ্রেপ্তার করার

জন্য (হেসে)। আমার কাছে জানতে চাইলেন কেনো এমন কার্টুন আঁকলাম। আমি বললাম কেনো একেছি। এরপর আমাকে নীচতলায় নিয়ে যেতে নির্দেশ দিলেন। সেখানে আমাকে জেরা করা হলো, কয়েকজন অফিসার জানতে চাইলেন কার বুদ্ধিতে আমি কার্টুনটা একেছি।

কার বুদ্ধিতে মানে?

উনারা জানতে চাইলেন এটা আমাকে কে আঁকতে বলেছে। প্রথম আলো সম্পাদক মতিউর রহমান কিংবা ডেইলি স্টার সম্পাদক মাহফুজ আনাম বা আর কেউ এমন কোনো নির্দেশ দিয়েছেন কিনা জিজ্ঞেস করলেন। আমি জানালাম এটা একান্তই আমার আইডিয়া। সেইসঙ্গে আমি ক্ষমা চাইলাম অন্য সবার হয়ে। বললাম যা শাস্তি দেবার আমাকে দিন, এই কার্টুনের সঙ্গে কোনোভাবেই আর কেউ জড়িত নন।
এর মধ্যে নীচতলায় থাকতে আমি প্রথম আলোর প্রথম পাতাটি দেখেছি, সেখানে দেখলাম ক্ষমা চাওয়া হয়েছে। আর বলা হয়েছে আমার কার্টুন আর কখনোই ছাপাবেন না তারা। ভাগ্যভালো যে সেখানে কয়েকজন আমার হয়ে কথা বলছিলেন। একজন আমার একটা ছবি প্রিন্টআউট এনে দেখালেন যেখানে আমি দুর্নীতি দমন কমিশনের কার্টুন প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরষ্কার নিচ্ছি। আরেকজন বললেন আমি একজন উদীয়মান কার্টুনিস্ট যে একদিন খুব বিখ্যাত হবে।

তাহলে সেখানে তেমন কিছু ঘটেনি?

ভয় পাওয়ার মতো কিছু হয়নি। তবে একটা চমকপ্রদ ঘটনা ঘটেছিলো। আমাকে তেজগাঁ থানায় হস্তান্তর করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো। সেখানে যাওয়ার আগে একজন গোয়েন্দা অফিসার আমাকে তার রুমে নিয়ে গেলেন। তার কম্পিউটারে দেখালেন আমার পুরষ্কার পাওয়া কার্টুনগুলো। বললেন তার ভাই নাকি ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালে চাকুরি করেন, তার কাছ থেকেই তিনি এগুলো সংগ্রহ করেছেন। এরপর আমাকে অনুরোধ করলেন একটা কার্টুন একে দিতে। আমি একটু বিব্রত হলাম। বললাম আমার মানসিক অবস্থা কার্টুন আঁকার মতো নয়। উনি পিড়াপিড়ি করতে লাগলেন যা খুশী একটা কিছু একে দিতে, উনি সেটা স্মৃতি হিসেবে রাখতে চান। অগত্যা আঁকলাম। একজন তরুণ ম্লান মুখে বসে আছে, আর অন্য একজন তার সঙ্গে কথা বলছে। ঠিক কার্টুন নয়, স্কেচ। তখনকার পরিস্থিতিটাই আমি কাগজে তুলে দিয়েছি। উনি খুব প্রশংসা করলেন সেটার। আমার সাক্ষর নিলেন।

এর মধ্যে কেউ যোগাযোগ করেনি?

না গোয়েন্দা অফিসে থাকতে কেউ করেনি। যখন আমাকে তেজগাঁ থানায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিলো তখন আমার চাচাতো ভাই আর এক মামা ফোন করে অভয় দিলেন। বললেন আমাকে মুক্ত করার সবচেষ্টাই তারা করবেন। এরপর প্রথম আলোর আরেক সাংবাদিক ফোন করলেন। তিনি বললেন এনএসআই (জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ক গোয়েন্দা সংস্থা) থেকে আমাকে ফোন করা হবে। আমি যেন তাদের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করি এবং তাদের জিজ্ঞাসাবাদের ঠিকঠাক উত্তর দিই।

তাহলে সিআইডির অভিজ্ঞতা তেমন ভয়ানক ছিলো না?

তা ঠিক। মানুষগুলো আসলেই ভালো। আমাকে যিনি তেজগাঁ নিয়ে যাচ্ছিলেন, উনি স্বান্তনা দিয়ে বললেন যে তার ধারণা আমি পরিস্থিতির শিকার। মনে হয় আমার গ্রাম্য চেহারা দেখেই তারা বুঝতে পেরেছিলেন যে আমি নির্দোষ। উনারা দিনরাত অপরাধীর পেছনে ছোটেন, তাদের চোখে ঠিকই ধরা পড়ে কে অপরাধী।

থানায় কি হলো?

গোয়েন্দা কর্মকর্তা আমাকে তেজগাঁ থানার ওসির কাছে বুঝিয়ে দিলেন। চলে যাওয়ার পরও তিনি আবার ফিরে এলেন আমাকে স্বান্তনা দিতে। বললেন ইনশাল্লাহ সব ঠিক হয়ে যাবে, আর থানার কর্মকর্তাদের অনুরোধ করলেন আমার উপর যেনো কোনো অত্যাচার না করা হয়। আমি ভীষণ অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম তার এই আচরণে। এরপর ওসি সাহেব আমাকে জিজ্ঞেস করলেন কেনো আমি এমন একটা কার্টুন আঁকলাম। জানালেন আমার জীবনের উপর হুমকি থাকায় সরকার আমাকে নিরাপত্তা হেফাজতে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এরপর উনি আমাকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রে সই করতে বললেন। হাজতখানার পাশেই একটা টেবিলে নাম-ঠিকানা লেখাতে গেলাম। ঝামেলা শুরু হলো তখনই। একজন দারোগা আমাকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি শুরু করলেন। কয়েকজন সেপাই তার সঙ্গে যোগ দিলো।

তারা কি মারলো আপনাকে?
না, গায়ে হাত তুলেনি। তবে ধর্মের অবমাননা করেছি বলে চৌদ্দগুষ্টি উদ্ধার করে ফেললো। এইসময় এনএসআই থেকে ফোন এলো। একজন অফিসার সেই আগের প্রশ্নগুলোই করলেন- কেনো একেছি, কার বুদ্ধিতে একেছি। বাকিদের উচ্চস্বরে গালাগালির মাঝে যতটা সম্ভব মাথা ঠাণ্ডা রেখে আমি প্রশ্নগুলোর উত্তর দিলাম। এক পর্যায়ে ওই দারোগা আমার ফোনটি কেড়ে নিয়ে পকেটে রেখে দিলেন। আর ফেরত পাইনি। এরপর আমাকে হাজতে পোরা হলো। রোজা ছিলাম, তাই ইফতারি করলাম বাকি হাজতিদের সঙ্গে। এরপর আমাকে আলাদা হাজতে একা রাখা হলো।

সাংবাদিকরা যোগাযোগ করেছিলেন আপনার সঙ্গে?

না। আমি শুনেছি তারা থানায় এসেছিলেন। তবে কেউ আমার সঙ্গে দেখা করেননি। আমাকে নিরাপত্তা হেফাজতে আনা হয়েছে এটা তাদের দেখাতেই আমাকে আলাদা রাখা হয়েছিলো। পরে অবশ্য বদলে গেছে অভিযোগ।

বদলে গেছে মানে?
আমাকে যখন আদালত থেকে জেলে পাঠানো হলো, তখন জানলাম আমার বিরুদ্ধে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত এবং রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে মামলা করা হয়েছে। মামলার বাদী হয়েছেন তেজগাঁ থানার ওসি।

তার মানে দেশ ও জনগণের শত্রু?

সেরকমই অনেকটা।

মাঝে একটা কথা জানা হয়নি। আপনাকে এনএসআই জিজ্ঞাসাবাদ করার মাঝ পথে যোগাযোগ যে কেটে গেলো, এতে তারা কিছু মনে করেনি? আপনার সঙ্গে কি যোগাযোগ করেছিলেন তারা?
আমি সেটা জানি না। তবে দোষ তো আমার না। উনারা অবশ্য যোগাযোগ করেননি আর।

জেলে কি ঘটলো? মানে আপনার অভিজ্ঞতা কি রকম?

আমার উপর দুটো হামলার ঘটনা বাদ দিলে খুব একটা খারাপ কাটেনি সেখানে। অনেকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। তবে আমার মনটা খারাপ থাকতো। মাকে ছাড়া দুটো ঈদ কেটেছে আমার কারাগারে। এই কষ্টটাই আমাকে পোড়াতো।

হামলা! কি রকম?

জেলে নেয়ার পর আমাকে আমদানী ওয়ার্ডে রাখা হলো। মুখে মুখে খবর রটে গিয়েছিলো যে আমি এসেছি। ওখানে কয়েদিদের মাইকে ঘোষণা দিয়ে ডাকার একটা ব্যবস্থা আছে। এমনি এক মিথ্যে ঘোষনা দিয়ে আমাকে চেনানোর জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর একদল লোক আমার উপর ঝাপিয়ে পড়ে। লাথি-চড়-কিল-ঘুষি চলতেই থাকে। এরপর একজন বাঁশ দিয়ে পেটালো আমাকে। ঘন্টাখানেক পর তারা আবার এলো। একজন পায়খানা থেকে কাঠি দিয়ে গু তুলে আমার মুখে ঘষে দিলো। আমি তখন রোজা। কষ্ট সহ্য করে মুখ ধুয়ে এলাম।

কেউ আটকায়নি? কারা ছিল তারা?

শুরুতে কেউ কিছু বলেনি। মারধোর চরম পর্যায়ে যাওয়ার পর অন্যরা আমাকে বাঁচিয়েছে। এরা ছিলো জেএমবির (জামাতুল মুজাহেদিন বাংলাদেশ) সদস্য।

কিভাবে বুঝলেন যে ওরা জেএমবির সদস্য?

আমি জিজ্ঞেস করে জেনেছি, পরে ওদের সঙ্গে কথাও বলেছি। সবাই জানে ওরা জেএমবি সদস্য।

কথাও বলেছেন?

ওরা আমাকে সারাক্ষণ চোখে চোখে রাখত। আমি কি করি, কোথায় যাই, কার সঙ্গে কথা বলি- সব নজরদারি করতো। কেউ কেউ আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করার চেষ্টা করেছে। তাদের দলে যোগ দেয়ার প্রস্তাব দিয়েছে। আমি বলেছি দেবো (হেসে)।

দেবেন!

ওদের পিছু ছাড়াতে কিছু একটা বলা দরকার, তাই বলেছি।

দুটো হামলা বাদ দিলে আর কোনো সমস্যা হয়নি তাহলে?

হামলার ঘটনার পর আমাকে মনিহার ওয়ার্ডে পাঠানো হয়। সেখানেও তারা হামলার চেষ্টা করেছিলো। এরপর আমাকে ছয়সেলে রাখা হয়। সেখানে আরাফাত রহমান কোকো (সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার ছেলে), অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন, ব্যবসায়ী আবদুল আওয়াল মিন্টুকে সঙ্গী হিসেবে পেয়েছি। নিরাপত্তার কারণে রোজার ঈদের নামাজ আমাকে জামাতে পড়তে দেয়া হয়নি, নিজের রুমে একা একা পড়েছি। কোরবানীর ঈদে অবশ্য জামাতেই পড়েছি।

বিখ্যাত লোকদের সঙ্গে দেখা হয়েছে, উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটেনি?

বলার মতো কোনো ঘটনা না। সবাই আমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতেন। কোকো ভাই আমাকে হাদিস পড়িয়ে শোনাতেন, বলতেন কার্টুন আর না আঁকতে কারণ এটা নাকি মুসলমানদের জন্য হারাম। আনোয়ার স্যার আমাকে খুব আদর করতেন। আমাকে কাগজ-কলম দিয়েছিলেন ছবি আঁকতে। আওয়াল স্যার আমাকে একটা রেডিও দিয়েছিলেন খবর শুনতে। কিছুদিন পর আমাকে নব্বই সেলে পাঠানো হলো। মুক্তি পাওয়ার আগ পর্যন্ত আমি সেখানেই ছিলাম।

আপনার সঙ্গে কেউ দেখা করেনি? মামলার কি অবস্থা কিভাবে বুঝতেন?

রোজার ঈদের আগের দিন ব্যারিস্টার সারা হোসেন এসেছিলেন আমার সঙ্গে দেখা করতে। আমাকে উনি চিন্তা করতে নিষেধ করেছিলেন। মুক্তি পাওয়ার কিছুদিন আগে থেকে আমার আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ মেলে। তার আগ পর্যন্ত আদালতে আমাকে নিয়ে যাওয়া হতো, এরপর নিয়ে আসতো। কিন্তু কারো সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পাইনি। এমনকি উকিলের সঙ্গেও না।

পরিস্থিতি বদলালো কিভাবে?

তত্বাবধায়ক সরকার থেকে উপদেষ্টা মইনুল হোসেনের পদত্যাগের পরপরই আমার মামলা ঘুরে যায়। প্রথম আলো থেকে আমাকে ক্ষমা চেয়ে আবেদন করার জন্য একটি কাগজ পাঠিয়ে তাতে সই করতে বলা হয়। এরপর বেশ দ্রুতই এগুলো আমার মামলা। একপর্যায়ে আমাকে সব অভিযোগ থেকে নিষ্কৃতি দিয়ে মুক্তি দেয়া হয়।

বলতে চাইছেন আপনার এই অবস্থার জন্য মইনুল হোসেন দায়ী?

না, আমি মোটেই সেটা বলিনি। আমি শুধু আমার মামলার মোড় ঘুরে যাওয়ার সময়কালটা উল্লেখ করেছি, বাকিটা কাকতালীয়। আমার এই পরিস্থিতির জন্য আমি মোটেই কাউকে দায়ী বা অভিযুক্ত করতে চাই না। দেখুন সুমন্ত আসলাম ভাইতো এখন ইত্তেফাকে (ব্যারিস্টার মইনুলের পত্রিকা) চাকুরি করছেন। উনার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। উনি আমাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

তাহলে এখন আপনার কি অবস্থা? কার্টুন আঁকেন আর?

অবশ্যই। আমি নিয়মিত অনুশীলন করি, কারণ আমি ভবিষ্যতেও আঁকতে চাই। যদিও আমার ধারণা কেউ সেগুলো ছাপবে না। তবে একদিন নিশ্চয়ই তারা ছাপবে। আমি তাদের বোঝাতে চাই যে আমি অন্যায়ের শিকার হয়েছি। তবে সাধারণ মানুষের অনুভূতিতে আঘাত দেয়ার জন্য আমি সত্যিই দুঃখিত। আমার লক্ষ্য খুব বড় কেউ হওয়া, যাতে আমাকে নিয়ে দেশবাসী গর্ব করতে পারে।

আপনি কি এখন নিরাপদ? জেএমবি আপনাকে কি ছেড়ে দিয়েছে বলে মনে করেন?

ওরা আমাকে ঘুমের মধ্যেও তাড়া করে। আমি সহজে কোথাও যাই না। কারো কাছে নিজেকে আরিফ বলে পরিচয় দিই না। তারপরও আমি স্বস্তিতে নেই। এরা যে কোনো কিছুই করতে পারে, আমাকে হত্যা করাটাও অসম্ভব না। ভয়ে আমি এখন দোকানেও বসি না।

আপনার এই সাক্ষাতকারটা ছাপালে আপনার কোনো ধরণের সমস্যা হবে বলে মনে করেন?

মনে হয় না। কারণ সরকার আমাকে মুখ না খুলতে কোনো নির্দেশ দেননি। তবে আপনি ছাড়া আমার সঙ্গে আর কেউ কথা বলতে চায়নি। আমি সবাইকে জানাতে চাই যে কাউকে বা কারো অনুভূতিকে আহত করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে আমার কখনোই ছিলো না। হয়তো কোনদিন বড় কিছু করে আমি তাদের এবং আমার দেশকে প্রতিদান দেয়ার চেষ্টা করবো। আমার একমাত্র ভয় জেএমবিকে। তাদের মনে কি আছে জানি না। জেলে থাকতে একজন আমাকে বলেছিলো আমাকে যে হত্যা করবে তার জন্য নাকি বেহেশত নিশ্চিত। এরা বেহেশতের জন্য যে কোনো কিছুই করতে পারে।

শেষকথা : আরিফ বেকার নয় পুরোপুরি। নির্বাচন কমিশন তাকে আসন্ন নির্বাচন উপলক্ষ্যে বিভিন্ন প্রচারণায় ছবি আকার দায়িত্ব দিয়েছে। পারিশ্রমিক খারাপ পাবে না হয়তো আরিফ। কিন্তু সবার আগে দরকার তার নিরাপত্তা এবং পুনর্বাসন। আরিফ সেই দিনটিরই পথ চেয়ে।

ছবি : মুস্তাফিজ মামুন